বিদ্যালয় পত্রিকা ‘যে নদী মপথে হারালো ধারা ’

চিরঞ্জিত ঘোষ

বিদ্যালয়ের পত্রিকা কি প্রচলিত অর্থে পত্র-পত্রিকার শ্রেণীভুক্ত । বিদ্যালয়ের পত্রিকার গুত্ব, সমস্যা ও ক্রমে অবলুপ্তির কারণ সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে । সম্পাদকমণ্ডলী ।

বিদ্যালয় পত্রিকা কি আদৌ প্রচলিত অর্থে পত্র-পত্রিকার শ্রেণীভুক্ত ? এই মূহুর্তে বাংলাভাষায় বিশেষত ছোট পত্রিক ার যে সমৃদ্ধ বিশাল জগৎ বিদ্যালয় পত্রিকা কি তার অন্তর্ভূক্ত হবার দাবী রাখে ? যদি এই দাবী আমরা স্বীকার করে নিই তা’হলে তাদের ভূমিকা বা গুত্বই বা কি ? ছাত্র-ছাত্রীদের ঐসব অপটু প্রয়াস কি আদৌ সাহিত্যপদবাচ্য ?

নয়ই বা কেন? অপরিণত মনের প্রারম্ভিক প্রয়াস বিদ্যালয় পত্রিকার মূল সম্পদ । সাহিত্যকীর্তি হিসাবে হয়ত তারা নগণ্য, অকিঞ্চিতকর, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তারা অমূল্য। আসলে প্রত্যেকটি শিশু, কিশোরই এক বিশেষ অর্থে দার্শনিক, ভাবুক, দ্রষ্টা। সব শিশুর মধ্যেই বাস করে একেকটি বিভূতিভূষণের ‘অপু’ । তার নতুন দেখা জগৎটা তার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। নির্নিমেষ চোখে সে দেখে তার চারপাশের জগৎটাকে । বুঝতে চায় তাকে নিজের মত ক’রে। তারই প্রক াশ ঘটে তার অপটু হাতের আখরে। তার বিদ্যালয়ের পত্রিকা ছাড়া আর কে স্থান দেবে তাকে ?

আত্মপ্রকাশের তাগিদই শিশু কিশোর লেখকের মূলধন, আত্মপ্রকাশেরই দাক্ষিণ্যই তার পুরস্কার। মনে পড়ছে, এক সদ্য কিশোর তার বিদ্যালয় পত্রিকায় ছোট্ট একটি রচনায় লিখেছিল তার আশর্চ্য কৌতূহলের বিষয় সম্পর্কে। পিঁপড়ের দীর্ঘ সারিবদ্ধ যাত্রা, তাদের চলার ভঙ্গী, চলতে চলতে দলবাঁধা আর ভাঙার নিয়ম — এই সবই ছিল ছোট্ট ছেলেটির গভীর কৌতূহলের বিষয়। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে পর্যবেক্ষণ করেছে তাদের, নিজে নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের গতিবিধির নিয়ম। তারপর তার নিজের মত করে , তার নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছে তার অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুধাবন আর তার সনিষ্ট প্রকাশ — সাহিত্য কর্মের চাবিকাঠিই ত’ এই । সে দিক থেকে স্বকীয় ভঙ্গীতে এমন মৌলিক অনুধাবনের প্রকাশ কি মূল্যবান নয় ? সদ্য কিশোরের সে রচনায় অবশ্যই শিল্পরূপগত কোন অভিনবত্ব নেই, নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ। কিন্তু তাই বলে কি সে বড়দের কাছে — বিশেষতঃ য ারা লেখা লিখি করেন , পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাঁদের কাছে অপাংক্তেয় হবে ?

বড়দের পত্রিকা মূলতঃ মনের প্রকাশ, ছোটদের পত্রিকা পরিণতি অর্জনের প্রয়াস। শিশুকে কথা কইতে শেখান তার ম া কত যত্ন করে। শিক্ষার, শিক্ষকের, বিদ্যালয়ের , দায়িত্বও ত তাই। শিশুকে কথা কইতে শেখানো। ঋিপ্রকৃতির অপার রহস্য যে বিস্ময়ের ঢেউ তোলে তার মনে তাই প্রকাশ পায় তার কথায়, আর সেই কথা স্থায়ী রূপ পায় তার লেখায়। ত াই শিশু কিশোরের লেখা — অপরিপক্ক, হয়ত কখনও অশুদ্ধ — একাধারে তার আত্মপ্রকাশের ও আত্মগঠনের উপায় ।

শিশুর শিক্ষাকে পণ্ডিতের তৈরী পাঠক্রমের গণ্ডী ভেঙ্গে শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রন াথ। বোলপুরের আশ্রম বিদ্যালয়ের অঙ্গনে তিনি বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছিলেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার চর্চার। মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গনে যেমন চলত নৃত্যগীতচর্চা, মহড়া চলতো নাটকের, তেমনি সোৎসাহে চলত সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি ওঅনুশীলন। বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের, বিভিন্ন ভবনের ছিল নিজস্ব পত্রিকা। তাছাড়াও অজস্র প্রাচীর পত্রিকা, হাতে লেখা পত্রিকা ছড়াছড়ি লেখালিখি আর পত্রিকার। আচার্য নন্দলাল উৎসাহ দিতেন শিল্পকর্মে, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ যোগাতেন কচি হাতের সাহিত্য সৃষ্টিকে।

মানুষের প্রাথমিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর অন্যতম প্রধান তার আত্মপ্রকাশের তাগিদ। এই তাগিদ সফল হ’লে সে যে

কৃতার্থতাবোধ করে সেটাই মানুষের সদর্থক আত্মবোধের ভিত্তি। এর অভাবে মানুষ হীনমন্যতাবোধের শিকার হয় — আত্মঅবমূল্যায়নের মধ্যে হারিয়ে যায়। আত্মপ্রকাশের সাফল্য — তা যত সামান্যই হোক না কেন — মানুষকে দেয় আত্মবিশ্বাস, সক্রিয় চিন্তার ক্ষমতা।

প্রশ্ন থেকে যায়, এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা কি কোনো পরিণতিতে পৌঁছায় ? কতজন পরিণত লেখত তৈরী হয় এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ? কিন্তু এইসব প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর। প্রকৃতিতে ফুল ফোটে অজস্র রকমের। তারা সবাই গোলাপ নয়। বর্ণে, গন্ধে, সৌন্দর্যে তাদের অনেকেই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টিশীলতা তাতেই সার্থক, প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্রের তারাই প্রকাশ। ।যত সুন্দরই হোক শুধু গোলাপ বেঁচে থাকলে, আর সব ফুল নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'লে কি কশ, রিক্ত চেহারা হবে প্রকৃতির ।

আরও একটা গুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে যায় বিদ্যালয় পত্রিকাকে জড়িয়ে। গুণীজনেরা আজকাল প্রায়ই হাহুতাশ করেন চারিদিকি অপসংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত দেখে, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তার ব্যাপকতা দেখে। কিন্তু এ কথাও ত আমরা সবাই জানি যে অসুস্থ সংস্কৃতির প্রসার রোধের সবচেয়ে ভাল উপায়, সম্ভবত একমাত্র উপায় সুস্থ সংস্কৃতির সক্রিয় চর্চা। যেখানে মনের শূন্যতা যত বেশী সেখানে আবর্জনা জমে তত দ্রুত। শিশু কিশোরেরা যদি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ না পায়, মনের পুষ্টি না পায় সুস্থ খাদ্যে, তাহলে অসুস্থ,অপসংস্কৃতির দিকে তাদের প্রবণতাই স্বাভাবিক। পড়া শোনা, দেখা, সংস্কৃতি চর্চার নিষ্ক্রিয়, অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী, হীনতর অঙ্গ। অনেক বেশী কার্যকরী সচেতনভাবে নিজে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া। লেখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সঠিকভাবে গড়ে ওঠে পড়ার অভ্যাস, গান গাওয়ার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সত্যিকারের সংগীত প্রবণতা। বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাই একান্ত জরুরী অসুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঠেকানোর জন্য। অনেক ছোট পত্রিকার মতই বিদ্যালয় পত্রিকারও গুত্ব এখানেই। সে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার হাতিয়ার, অপসংস্কৃতির বিদ্ধে লড়াই-এরহাতিয়ার।

একটা সময় ছিল যখন বিদ্যালয়গুলি থেকে মোটামুটি নিয়মিতভাবে তাদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশিত হত। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অথবা পুরষ্কার বিতরণ উপলক্ষে তার আত্মপ্রকাশ ঘটতো। মুদ্রিত বার্ষিক সংখ্যা ছাড়াও কোথাও কোথাও দেখা যেত আরও নানা প্রচেষ্টা— দেওয়াল পত্রিকা , হাতে লেখা পত্রিকা, এমনকি কোনো শ্রেণীর নিজস্ব পত্রিকা।

কিন্তু সে ধারা আজ ক্রমশ ক্ষীয়মান । অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পত্রিকা প্রকাশ আজ আর তার আবশ্যিক কর্মধারার অঙ্গ নয়। কোনো বিশেষ উপলক্ষে, দীর্ঘ সময় অন্তর অনিয়মিত তার প্রকাশ। এতে বিদ্যালয় পত্রিকার মূল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যায়। এমনকি বছরে একটা বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশও সে উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয় । এরজন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকতা, প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত প্রকাশ। একমাত্র তাহলেই বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকৃত অর্থে 'সাময়িক পত্রিকা'র চরিত্র ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে। সমস্যা তো আছেই । আছে আর্থিক দৈন্য, সময়াভাব, সবচেয়ে বেশী আছে উদ্যোগের অভাব। অথচ কি আশ্চর্য ! এই অবস্থার মধ্যেও ত পত্র-পত্রিকার , বিশেষতঃ ছোট পত্রিকার কোন অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে না নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদ্যোগী মানুষের! তাহলে বিদ্যালয়স্তরে এই দুরবস্থা কেন ?

অথচ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি বিদ্যালয়ে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের ঢল নামে। লেখার ইচ্ছা, তাগিদ জন্মায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে। ভাল-মন্দ-মাঝারি নানা মানের অসংখ্য লেখায় উপচে পড়ে সম্পাদকের দপ্তরে। আবার প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে গেলেই ভাঁটা পড়ে তাদের উৎসাহে।

আগেই বলেছি বিদ্যালয় পত্রিকার ধারা আজ ক্ষয়িষ্ণু, মভূমিতে অবলুপ্ত নদী প্রবাহের মত। বড় বেদনাদায়ক এই ক্ষতি। যে কোন মানুষ যিনি সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে, শিশুদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের পক্ষে তার পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। পত্র-পত্রিকার জগতের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, সুস্থ চেতনা প্রসারের যারা সৈনিক তাদের সকলকেই নিশ্চয়ই ভাবাবে আমাদের চারপাশ থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর মত বিদ্যালয় পত্রিকার এই ক্রম অবলুপ্তি।

(লেখক, বোদাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ।স্কুলের পত্রিকা 'সবুজ পত্র' - এর সম্পাদনা করছেন দীর্ঘদিন। প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্রিকায় ।)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com